LEARN GEETA
तस्मात् योगी भवार्जुन

॥ श्रीहरि ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें ॥

॥ শ্রীমদ্ভগবদগীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ॥

অধ্যায় 16: দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ

1/2 (শ্লোক 1-1), রবিবার, 04 জুন 2023

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিশারদ ড: আশু গোয়েল মহাশয়

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/VeLBt2S86-4

নির্ভীক মন - দৈবী গুণের প্রেরণা

ॐ असतो मा सद्गमय।

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्मामृतंगमय ॥

অজ্ঞান থেকে জ্ঞান।
অন্ধকার থেকে আলো।
মৃত্যুর অমৃতে যাওয়ার দিশা দেখাও প্রভু।

করুণাময়ী ইশ্বরের বন্দনা, শ্রদ্ধেয় গুরুজনদের সাক্ষাত প্রণাম এর সাথে ভরত বংশের গৌরবশালী সনাতন পরম্পরা অনুসারে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। ইশ্বরের অত্যন্ত মঙ্গলময়ী কৃপা আছে যার পরিণাম স্বরূপ আমাদের জীবন সফল করার জন্য, জীবনে উন্নতি করতে ও বিজয়ী হওয়ার জন্যে এবং জীবনে সাত্বিকতার ভাব প্রবল করার জন্য গীতার মাধ্যমে আমাদের নির্বাচন করা হয়েছে। আমাদের এই জন্মের পূণ্য কিংবা পূর্ব জন্মের কৃত পুণ্যের প্রভাব অথবা দিব্য সন্তর আশীষ স্বরূপ আমাদের ভাগ্য উদয় হয়েছে। যার জন্য আমরা গীতাতে ব্রতী হয়েছি। আগের তেপ্পান্ন বছরে সম্পূর্ণ বিশ্বের বিচারকগণ ভগবত গীতাকে দেখে হতবাক হয়ে গেছেন। আদি শঙ্করাচার্য জী তার দিব্য বাণীতে গীতার মহাত্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

“ভগবদ্ গীতা কিঞ্চিদধীতা,গঙ্গা জললব কণিকাপীতা।
সকৃদপি যেন মুরারি সমর্চা,ক্রিয়তে তস্য যমেন ন চর্চা ॥”

অর্থাৎ - যদি সাধকের সম্পুর্ণ জীবনে পরম গীতাজির একটু অংশও এসে যায় তো স্বয়ং যমরাজ ও সাধকের নামে চর্চা করতে ভয় পান। এই হলো গিতাজীর প্রভাব। প্রাচীন সাধক কিংবা এযুগের বিচারক যেমন - মহাত্মা গান্ধীজী মাননীয় তিলক জী ইত্যাদি মহাপুরুষ গণ
শ্রীমদ্ভগবদগীতা রূপী সমুদ্র থেকে জ্ঞান রূপী অমূল্য রত্নর খোঁজ করেন। এই শাস্ত্র বিজয়ের শাস্ত্র মানা হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতা এই জন্যেও অতুলনীয় কারণ এতে ঈশ্বর ইহলোকে আর পরলোকে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল এর

ব্যাপারে বলেছেন।অনেক জ্ঞানের বই যেমন জয় আপনার - ইউ ক্যান বিন ইত্যাদি বই পড়ে আমরা ইহলোকের জীবনের সংশোধন করতে পারি। এতে আমাদের নিজের বর্তমান জীবনকে সফল করার কৌশলের কথা বলা হয়েছে। ধন লাভ, সফল হবার উপায় নিজেকে কিভাবে প্রভাবশালী করা যায় ইত্যাদি প্রভাবশালী ব্যাখ্যা আপনাদের বর্তমান নশ্বর জীবন সংশোধনের সহায়ক হয়। ভাগবতে পরলোক সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। গীতাজী এক এবং একমাত্র গ্রন্থ যা ইহলোকে এবং পরলোকে আমাদের সব সূত্র অর্থাৎ সিদ্ধান্তের শিক্ষা আমাদের দেয়। কিভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য কর্ম করব। কিভাবে বিজয়ী হওয়া যাবে তার সঠিক সময় মনে করায়, "**সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢনিশ্চয়ঃ।**", অর্থাৎ সাধক কিভাবে বর্তমান জীবন অতিবাহিত করেন যার মাধ্যমে তিনি শাশ্বত সফল হতে পারেন, এই পথ একমাত্র শ্রীমদ্ভগবদগীতার অধ্যয়নের দ্বারাই প্রাপ্ত করা যায়।

প্রভু তিনটি নীতির সতোগুণ, তমোগুণ ও রজোগুণের ব্যাপারে গীতাজিতে বলেছেন। স্বয়ং ঈশ্বর নিজের শ্রীমুখ থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ে এটা বলেছেন যে এই তিনটি গুণ - সতোগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ সকল মানুষের মধ্যেই থাকে, কোনো মানুষই এর ব্যতিত নয়, একজন ভালো সাধকের ও তমোগুণ থাকে। সেরকম একজন দুর্জনেরও সতোগুণের অংশ থাকে। সকল ব্যক্তিই রাত্রে নিদ্রা যায়। আর নিদ্রা তমোগুণের প্রতীক। কিন্তু আমরা ছয়ঘণ্টা বা দশঘন্টা, যেমন যেমন নিদ্রার সময় বাড়াতে থাকব তেমন তেমন তমোগুণের মাত্রা ও বাড়তে থাকে। পরের উদাহরণ - প্রমোদ রজোগুণের উদাহরণ। আমরা কোনো কাজ বা কাজ করার প্রবণতা করি তো সেটা রজোগুণের অন্তর্গত বলা হয়, কিন্তু মানুষ বা প্রাণী কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। কার্য কলাপ করা খুব প্রয়োজীয়। কিন্তু সব সময় করা কিছু অপ্রয়োজনীয় কাজ যেমন বার বার মাথা হেলানো, চুলে হাত বুলানো, শাড়ি ওড়না এইসবকে অকারণে হাথ দিয়ে ধরে থাকা অর্থাৎ সব রকম অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম রজোগুণ বৃদ্ধি করে। প্রয়োজন ছাড়া কোনো বিষয়ের ব্যাপারে কাজ করা ,উদাহরণ হিসেবে রাস্তা থেকে কোনো জোরে আওয়াজ শুনে তৎক্ষণাৎ কি হয়েছে বলে উত্তর দেওয়া। কি হচ্ছে? এইসব ব্যাপারে অকারণ সময় নষ্ট করা খুব বেশি রজো গুণের লক্ষন।সেই সতোগুণ ব্যক্তির জীবন শান্তিতে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। কর্তব্য কর্মের করে বা কোনো অপ্রয়োজনীয় কর্ম না করে। এইরূপ সাধকের মধ্যে অন্য রকম ধারা দেখা যায় যেমন স্বামীজী, সাধু মহাত্মা দের মধ্যে এই রকম জীবন দেখা যায়। এর দ্বারা প্রভবিত হয়ে সবাই এনাদের ভক্ত হওয়ার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে বা উনার আশির্বাদ পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করতে থাকে। এই রকম তেজস্বী ব্যক্তিত্ব যে রকম লোহাও পরশ পাথরের সংস্পর্শে সোনাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, এই প্রকার মহান সাধু জনের দর্শন বা সৎসঙ্গ থেকে প্রত্যেক প্রাণীরই হীরের মত অতুলনীয় চমক প্রকাশ পায়।সুতরাং এই কথা স্পষ্ট যে সবাই সতোগুণ ব্যক্তির সাথে থাকতে চায়। একজন অলস ব্যক্তি যে সব সময় নিজের কাজে বিলম্ব করে যার মধ্যে সবসময় তমোগুণের প্রবলতা দেখা যায় যার সাথে কেহ এক মুহূর্তও কাটাতে চায় না। এই রকম ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকলে অলস তমোগুণের মাত্রা বাড়তে থাকে। সব মননশীল সাধক এটা জানতে চান যে কিভাবে সতোগুণ প্রাপ্ত করা যায় - পাঁচটি গ অনবদ্য তারণ মানা হয়েছে - গরু, গীতা, গায়ত্রী, গঙ্গা, গোবিন্দ। গীতাতে এই পাঁচটি বিস্তৃত রয়েছে। এগুলো শাশ্বত অর্থাৎ এদের পরিবর্তন অসম্ভব। কোনো জিনিস, ঘটনা , পরিস্থিতির পরিবর্তন বা অসমনতা থাকে তখনই তুলনা করা হয়। যেমন ধনী-গরীব, শুভ্র-শ্যাম। এখন এটা বিচার করার মতো কথা যে যদি সবার কাছে সমান পরিমাণে ধন থাকে তাহলে কেও গরীব বা ধনী থাকবে না সবাই সমান হবেন (যদি সবার কাছে এক লাখ টাকা থাকে, কারোর কাছে নয় হাজার বা এক লাখ দশ হাজার তাহলে সবাই সমান) একজন শ্যাম বর্ণ ব্যক্তির সামনে কেও ততক্ষণই ফর্সা যতক্ষণ না তার থেকেও ফর্সা কোনো ব্যক্তি না এসে যায়। (কোনো ইংরেজ ব্যক্তির সামনে আমরা শ্যাম বর্ণ হতে পারি কিন্তু অফ্রিকান ব্যক্তির অপেক্ষায় ফর্সা বলা হবে।)

16.1

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং (ম্) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (র্), জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।

দানং(ন্) দমশ্চ যজ্ঞশ্চ, স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥1॥

শ্রী ভগবান বললেন- ভয়ের পরম অনুপস্থিতি; বিবেকের পরম পরিশোধন; জ্ঞানের জন্য যোগব্যায়ামে দৃঢ় অবস্থান; সাত্ত্বিক দান; ইন্দ্রিয় দমন; যজ্ঞ; নিজ পাঠ; দায়িত্ব পালনের জন্য ভোগান্তি পোহাতে হয় শরীর-মন-কথার সরলতা।

ছাব্বিশ প্রকার উল্লেখযোগ্য গুণের মধ্যে ভক্তবৎসল ঈশ্বর সবার আগে অভয় কে মহত্ব দিয়েছেন, যেমন ইঞ্জিনের পিছনে রেলগাড়ির বাকি অংশ চলে সেইরকম একজন সাধারণ মানুষ যে প্রভুর লীলা থেকে একেবারে অনভিজ্ঞ তার অভয় এর মহত্ত্ব জানা নেই। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অভয়কেই এই ছাব্বিশ দেবীও গুণের চালক অর্থাৎ ইঞ্জিনের রূপে প্রস্তুত করেছেন।

অভয়ের আক্ষরিক অর্থ ভয় না হওয়া অর্থাৎ কোনো রকম ভয় না লাগা অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভয় পায় না তাকে অভয় বলে। হিতোপদেশ নামে প্রাচীন গ্রন্থতে লিখিত আছে যে -

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনং চ সামান্যমেংতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্মেংণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ

অর্থাৎ ভোজন করা, নিদ্রা অর্থাৎ ঘুমানো ভয় এবং মৈথুন অর্থাৎ সন্তান জন্মদান, মানুষ এবং পশুদের এই তিন প্রকার লক্ষণ একই রকম। মানে পশুও খাবার খায়, ঘুমায়, সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু মানুষের মধ্যে বিবেচনার কথা হলো এই তিনের সাথে ভয়কেও যুক্ত করা হয়েছে যা এই তিন এর থেকে সবসময় ভিন্ন।

কিন্তু জ্ঞানী ঋষিরা বলেন :- পশু যখনই এই কাজ করে তখন না ভেবেই করে, অর্থাৎ যখন খুশি যা খুশি খেয়ে নেয়, যখন খুশি যেখানে খুশি ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু মানুষ সব কাজই নিয়ম মেনে করে যেমন সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া, সঠিক সময়ে রাত্রে ঘুমান ইত্যাদি, যেখানে একটি পশু উদাহরণ কুকুর যখন ইচ্ছে যা ইচ্ছে খেয়ে নেয়, যদি ইচ্ছে হয় তো দিন দুপুরে রাস্তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে, কখন কোথায় কি করতে হবে পশুদের সে ধারণা থাকে না।কিন্তু মানুষ প্রতিটি কাজকে ধর্মের দৃষ্টিতে বা মানদণ্ডের বিচারের মত মেপে ঝোপে করে।কাজটি কি ধর্ম সঙ্গত, উচিৎ বা শ্রেষ্ঠ কিনা? এই সব বিচার করেই মানুষ তার কাজ করে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর সেই পশু মানুষের উপর বিশ্বাস করতে থাকে।

বাস্তব দেখা যায় তো মানুষের ও অভয় এর প্রয়োজন আছে।এখানে অভয় আর ভয় না পাওয়া এই দুই এর তফাৎ জানা প্রয়োজন।

ভয় আমাদের ভুল পথে চলার থেকে আটকায়।ভয় নিম্ন লিখিত তিন প্রকার: প্রথম ভুল কাজ করার সময় যে ভয় হয়
দশানন রাবণ ইতিহাসে এক অতি প্রভাবশালী ও শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তপস্যার দ্বারা সবচেয়ে অধিক বলশালী রাবণ যখন জনকিজী কে হরণ করতে যান তখনকার স্থিতি বর্ণনা করে গোস্বামী তুলশীদাস জী বলেন:-

জাকেঁ ডর সুর অসুর ডেরাহীঁ। নিসি ন নীদ দিন অন্ন ন খাহীঁ
সো দসসীস স্বান কী নাঈঁ। ইত উত চিত্তই চলা ভড়িহাঈঁ॥
ইমি কুপংথ পগ দেত খগেসা। রহ ন তেজ তন বুধি বল লেসা॥5॥

অর্থাৎ রাবণ যে অতি বলশালী ছিলেন, সীতাকে অপহরণ করার এমন অবস্থায় ছিলেন যেন একটা কুকুর রুটি চুরি করার সময় যেন লুকোচুরি খেলছে। তারপরও হনুমান জী আসতেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। যখন শ্রীরাম সেনা সমেত লঙ্কা নগরীর তীরে আসেন তখনও সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। দশানন খুব ভালো করেই জানতেন যে, সে ভুল কাজ

করেছে, সেই কারণেই ভয়ে ভীত হয়ে ছিল। ভুল কাজ আমাদের মনে ভয়ের উদ্বেগ তৈরী করে, কারণ সব সময় মনের মধ্যে ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। কেউ বুঝতে পরে না যে এই ভাবনা সব সময় আমাদের ভীত করতে থাকে, খারাপ কাজ করার ভয় সব সময় যথাযথ হয়।

কিন্তু কখনো আমরা দেখি যে লোক বিনা কারণেই ভয়ভীত হয়ে পড়ে। মনে বেকার চিন্তা, যেমন ছেলের বিয়ের পর তার স্বভাব কেমন হবে, সংসারে সবাইকে সন্মান করবে কি না ভালোবাসবে কি না? ছেলের ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন হয়ে যাবে না তো ইত্যাদি।

নতুন সরকার গঠনের জন্যে ভোট হয়েছে। কি জানি কোনো নতুন রকমের কর বা ট্যাক্স চালু করে দেবে না তো? অর্থাৎ সবসময় একেবারে অপ্রয়োজনীয় ভয় যার কোনো মানে হয় না।
ধর্ম পালনের জন্যে ভয় করা প্রয়োজন। হিন্দি শব্দ ভাণ্ডারে দুইটি শব্দ আছে বেপরবাহ আর লাপরবাহ। সাধক সঞ্জীবনী তে শ্রদ্ধেয় শ্রী রামসুখ মহারাজ জী বলেছেন সাধক কে বেপরবাহ হতে পারে কিন্তু লাপরবাহ নয়। লাপরবাহ মানে যে কোনো কাজ করার আগে কোনো রকম বিচার করে না।কাজ কখন করতে হবে? কেন করতে হবে? কাজের কোনো গুরুত্ব আছে কি নেই? এই চিন্তা না করেই কাজ করে ফেলে, কিন্তু একজন বেপরবাহ ব্যক্তি সব কাজ ধ্যান ধারণার সাথেই করে কিন্তু কর্ম ফলের চিন্তা করে না। বেপরবাহ মানুষের এটা একটা গুণ, তাদের মনে সব সময় একটা ধারণা থাকে যে সেটাই হবে 'যা রামের ইচ্ছে।' যে ভয় গুরু কে, শাস্ত্র সমূহ কে নিজের গুরুজনদের মনে রেখে করা হয় সে ভয় উচিৎ ভয়। এর জন্যে অভয় শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। পরশুরাম প্রসঙ্গে : পরশুরাম জী ক্রোধের বশে শ্রী রাম জী আর শ্রী লক্ষ্মণ জী কে বলেন যে রাম তুমি কি জানো যে আমি একুশ বার ক্ষত্রিয়দের কে বিনাশ করেছি, কিন্তু বালক তুমি এত নির্ভীক কেন? শ্রী রাম জী বলেন যে আমরা আপনার অনুগামী, আপনার ভক্ত তাই কেবল আপনাকেই ভয় পাই। যে সবচেয়ে সন্দেহজনক ভয় পায় তাকে অন্য কাওকে ভয় করার প্রয়োজন নেই, যে ব্যক্তি বা সাধক ধর্মের শৃঙ্খলা গুরুর শাসন আর বড়দের শাসন মেনে চলে তার জন্যে জীবনে বাকি সব ভয় একেবারে চলে যায়। সে এক অবোধ বালকের মতো যে নিজের পিতার উপর অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নিশ্চিত শান্তিতে ভয় মুক্ত হয়ে যায়। এই রকম বালকের পথ ভ্রষ্ট হওয়ার কিংবা আঘাত লাগার বিন্দু মাত্র ভয় থাকে না। কিন্তু এর উল্টো মানে যে ধর্ম গুরু কিংবা গুরুজনদের কে বিশ্বাস করেনা সে সব সময় ভয়ভীত থাকে।

আমাদের সাথে শ্রী রঘুনাথ তাই, কিসের চিন্তা।
কপাল যখন সাথে আছে তো, কিসের চিন্তা।

যে ভগবত নামে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে অভয় কে প্রাপ্ত করে সেই উত্তম সাধক। আমরা যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট। ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে পরমাত্মা সেটা ফিরিয়ে নেবেন, চিন্তা কিসের!সব চেয়ে বেশি ভয় হয় প্রিয় জিনিস হারিয়ে যাওয়ার বা চলে যাবার ভয়। সুতরাং ঈশ্বর বলেন নিজের ভিতরে দৈব গুণ স্থাপন করতে চাও তাহলে সর্ব প্রথম অভয় প্রাপ্ত কর।

স্বত্ত্বসংশুদ্ধি:- অর্থাৎ বিবেক এর শুদ্ধি করণ ও নিজের মন কে স্বচ্ছ নির্মল করা, যখন শ্রী রাম শবরীর সাথে দেখা করতে আসেন তখন উনি বলেন - " মোহে..... ন ভাবা"। ভগবানের নিজের সাধকের মনে কোনো রকম গোপনীয়তা পছন্দ নয়। বিবেক শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্যে একটি সহজ উদাহরণ - আমরা যখন সকালে দুধ নিতে যাই তখন প্রথমে দুধ নেবার পাত্র টি ভালো করে ধুয়ে নিই। তারপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা হয় যাতে এটা বিশ্বাস হয় যে দুধ নেবার জন্য পাত্র একদম পরিষ্কার। আমরা এটা জানি যে বাসনে যদি কোনো রকম নোংরা থাকে তাহলে দুধ নষ্ট বা খারাপ হয়ে যেতে পারে। যদি দুধ নোংরা পাত্রে রাখা না যায় তবে সর্ব মঙ্গলময় সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান আমাদের মলিন বা কপট হৃদয়ে কিভাবে থাকতে বা স্থাপিত হতে পারবেন। মনের মধ্যে ছলনা কপটতা আমাদের ঈশ্বর এর সাথে মিলিত হতে দেয় না।
যদিও ঈশ্বর আমাদের ওই মনেই থাকেন কিন্তু সাধকের তার সাথে মিলন হতে পারে না। বিশেষ করে সাধক এইভাবে বিচলিত হয়ে যায় যে উনার অসংখ্য নাম জপ, অসংখ্য পাঠ, ব্রত, কথা, পঠন- পাঠন এর মন মত ফল পায় না। পঞ্চদশ অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে -

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ।।১৫.১১।।

সুতরাং শুদ্ধ বিবেকের অভাবে এই জীবনে পূণ্য কর্ম ফলপ্রসূ হয় না কিন্তু এর ফল আমাদের পরের জন্মে প্রাপ্ত হতে পারে। বিবেক শুদ্ধ আর নির্মল করার জন্য সৎ আচরণ যুক্ত ব্যবহার করা উচিৎ। সত্য কথা বলা, নিন্দা থেকে দূরে থাকা উচিৎ। এই রকম ব্যবহার করলে মন পরিষ্কার হয় আর ঈশ্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা হতে পারে।

জ্ঞানযোগব্যাবস্থিতি:- অর্থাৎ জ্ঞান যুগে যার বরাবর স্থির অবস্থা। এটা প্রায় দেখা যায় যে কোনো আত্মীয় বা পরিচিতির মৃত্যুতে শ্মশানে জ্ঞানের কথা বার্তা হয়, যেমন সকলের মৃত্যু যখন নিশ্চিত এত ধন, বড় বাড়ি, গাড়ি, কাপড় সংগ্রহ করা কিসের জন্য? শ্মশান ভূমিই তো সবার শেষ গন্তব্য স্থল। সবাইকেই কাঠের তক্তা আর ওই সূতি বস্ত্র জড়িয়েই যেতে হয় কোনো অন্য বস্ত্রে কাজ হয় না ইত্যাদি।কিন্তু শ্মশান ভূমি থেকে ঘরে ফিরেই এই সব কথা ওই লোকেরা ভুলে যায় আবার দৈনন্দিন কাজে লেগে যায়। যেমন চায়ের পিপাসা তাদেরকে তাড়া করতে থাকে। এরকম বৈরাগ্যের কথা ঢেউ এর মত মনে আসে। আবার শীঘ্রই চলে যায় ঈশ্বর বলেন যখন জ্ঞান শ্বাশত হয় তখন আমাদের মন স্থির অর্থাৎ চিরস্থায়ী হয় আমাদের মনে সৎ বিচার নিশ্চিত রূপে আসে, তীব্র গতিতে আসে কিন্তু চিরস্থায়ী হয়ে গেলে তখনই আমাদেরকে জ্ঞান যোগে স্থির বলা হবে।

দান - দান মানে কিছু দেওয়ার অভ্যাস। যে কিছু দেওয়ার ভাবনা রাখে। ঈশ্বর এর জন্য মানুষের দুটি শ্রেণী বানিয়েছেন। একজন দাতা আর একজন গৃহীতা। আমরা কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই কথার বিচার করতে থাকা উচিৎ। আমরা যারা এই বিবেচন সত্র শুনছি নিজেকে দাতার শ্রেণীতে মান্যতা দিতে পারি। কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকের পরিস্থিতি গ্রহীতার শ্রেণীতে পড়ে। কারোর সাথে কিছু পাবার আশা সব সময় মনের মধ্যে থাকে। যেখানে পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদেরকে দাতার শ্রেণীতে রেখেছেন। দাতাকে সব সময় মহান বলা হয়। কিন্তু আমরা নিজেদের মতি ভ্রম হবার জন্যে সব সময় ভিক্ষার আখাঙ্খা করতে থাকি। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে দেবার যোগ্য করেছেন। যার ধন দেবার সামর্থ আছে সে ধন দান করে। বর্তমানে গীতা শিক্ষার পরিবারে বিভিন্ন সাধক নিঃস্বার্থ ভাবে তাদের সেবা দান করেন। কেও সময় দান করেন তো কেও জ্ঞান। তার পরিবর্তে করো কাছে কিছু দাবি করেন না। একজন মানুষের খুশি অন্যেকে আনন্দ দান করতে পারে। যখন ই আমরা কারোর সাথে সাক্ষাত করবো হাসি মুখে করবো, সেটাও একরকম আনন্দ দান। একজন প্রসন্ন মনের সাধকের সাথে সাক্ষাত করার পর সবার মন খুশি হয়ে যায় দুঃখ যন্ত্রণা কম হয়ে যায়। মন শান্ত হয়ে যায়। যখন আমরা কারোর সাথে হাসি মনে সাক্ষাৎ করি তখন তার দুঃখ কষ্ট নিজে থেকেই কমে যায়।এরকম করে আমরা স্বচ্ছতার দান করতে পারি। রাস্তাতে পড়ে থাকা নোংরা নোংরা দাবিতে ফেলে রাস্তা পরিষ্কার করা আরো একটি স্বচ্ছতার দান। কোনো ব্যক্তিকে যখন আমরা সহানুভূতির কথা বলি তখন তাদের মন শান্ত হয়ে যায় এইরকম দানের জন্যে কোনো রকম খরচ করতে হয় না। বরং অশান্ত মানুষ পরম শান্তি পায়। যদিও এই দান খুব সহজ তবুও বেশির ভাগ মানুষ এই সহানুভূতি টুকু দেখাতে আলস্য করে। মধুর গান যা ওই ভাব কে প্রকাশ করে যেমন

দেশ আমাদের সব কিছু দেয়,
আমরাও তো কিছু দিতে শিখি।।
সূর্য্য আমাদের আলো দেয়,
হাওয়া নতুন জীবন দেয়,
আমাদের সবার খিদে মেটাতে,
ধরিত্রীতে চাষ হয়,
অন্যের ও ভালো হোক যাতে,
আমরা এরকম কিছু করতে শিখি।।
যে নিরক্ষর তাকে পড়াও,
যে নির্বাক তাকে বাণী দাও,
পিছিয়ে পড়াদের এগিয়ে দাও,
তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী কে জল দাও,

আমরা পরিশ্রম এর দীপ জ্বালিয়ে,
নতুন আলো আনতে শিখি।।

কোনো নির্দিষ্ট দিন সময় যেমন একাদশী, জন্মদিন, পূর্ণিমাতে দান করা উচিত, কিন্তু কেবল মাত্র এই তিথি গুলি অনুসারেই দান করা উচিত নয়। বাস্তবে আমাদের মনোবৃত্তি এমন হওয়া উচিত যে , সব সময় যে কোনো রকমের দান দেবার জন্যে আমরা ব্যগ্র থাকি। শ্রদ্ধেয় শ্রী রামসুখ মহারাজ জী বলেছেন যে ভগবান আমাদের এই শরীর দান করেছেন অন্যের সেবা করার জন্যে। সুতরাং আমাদের এটা সর্বদা ভাবা উচিত যে আমরা কিভাবে কারোর কাজে আসতে পারি। যদি আমাদের এই শরীর বা দেহ কারোর কোনো কাজে লাগে তো সেটা সবচেয়ে বড় কথা। বেশি দূরে না গিয়ে আমরা আমাদের পরিবার ,একসাথে কাজ করে এমন লোকের কিভাবে সাহায্য করতে পারি। এটা মনে রাখা দরকার।আমরা আমাদের পরিচিত , আত্মীয় স্বজনের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত থাকি, কিন্তু যারা আমাদের কাছে কাজ করে তাদের সাহায্য বা সেবা করার কথা মনেই আসে না। যদি আমরা কখনো সাহায্য করি তো পরিবর্তে কোনো কিছু পাবার আশায় রাখি। ঘরের কাজের লোককে কাপড় দিয়ে এটা জেনো মনে না ভবি যে কাপড় নেবার পরই ছুটি না চায়।প্রতি উপকারের আশা না করে সব সময় দান করা উচিত।

ঈশ্বর আমাদের যে জ্ঞান, বিচার, সময়, যোগ্যতা দিয়েছেন তার ব্যবহার আমরা কিরকম ভাবে সংসারের কল্যাণের জন্য করি নিষ্কাম বা নিঃস্বার্থ হয়ে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

শক্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংযম! নিরর্থক কাজের অভাব যেমন অর্থ হীন ভাবে হাত পা নাড়ানো, বেকার কথাবার্তা বলা নিরর্থক কথা শোনা দেখা যেমন ফেসবুক এ লাইক ,স্ট্যাটাস আপডেট এইসব বার বার দেখতে থাকা অপ্রয়োজনীয় বা অর্থহীন কাজ। দম অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর আমাদের সংযম অর্থাৎ আমরা কি দেখবো ,কি শুনবো ,কি বলবো, কি করবো, কি খাবো এই সবের উপরে সংযম কে শক্তি বলা হয়। যা প্রয়োজন কেবল অর্থ পূর্ণ কাজ লোকের কল্যাণ এর জন্যে করা আর অপ্রয়োজনীয় কাজ না করা কে শক্তি বলা হয়।

সাধারণ **যজ্ঞ** : আগুনে আহুতি কেই যজ্ঞ বোঝে। গীতাতে চতুর্থ অধ্যায় এ শ্রীকৃষ্ণ বারো প্রকার যজ্ঞের বর্ণনা করেছেন। দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "যজ্ঞ সমূহের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ"। অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞ ঈশ্বর নিজেই অর্থাৎ জপ সাক্ষাত ইশ্বরের বিভূতি। যজ্ঞের সাধারণ অর্থ হলো নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের কাজ করলাম ফলের আশা না করে এক জন মা এর কি কর্তব্য? সে নিঃস্বার্থ ভাবে করে। ঠিক ওই রকম পিতাও নিজের কাজকে অর্থাৎ নিজের কাজকে নিঃস্বার্থ ভাবে করে। একজন শিক্ষক হিসেবে, মালিক হিসেবে আমাদের যা কর্তব্য সেটা আমরা j যেন নিঃস্বার্থ ভাবে পালন করি। যেই রূপে আমি আছি সেখানে যা আমার কর্তব্য সেটা সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে করি এটাই যজ্ঞ। কর্তব্য ভাবনা থেকে কর্ম করতে হয়। যখনই ভাগবত পাঠ হয় তখন পড়ে শ্রী মদ্ ভাগবত কথা জ্ঞান যজ্ঞ লেখা হয় কারণ সমস্ত লোক কল্যাণ এর জন্যে জ্ঞানের যজ্ঞ করা হচ্ছে।
স্ব-অধ্যায় সাধারণত কিছু পঠন বোঝায়! স্বাধ্যায় শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে স্ব-অধ্যয়ন অর্থাৎ আমি কে সেই চিন্তা।
আমরা যে কাজই করি গীতার পঠন পাঠন বিবেচন শুনি তো শাস্ত্র পড়ি তো কারোর সাথে প্রভুর সাথে চর্চা করি এই সব স্বাধ্যায়! যে বিষয় আত্মবোধ জ্ঞানের সাথে যুক্ত তাকে স্বাধ্যায় এর অন্তর্গত মানা হয়। ভক্তি ভাবের সাথে টিভিতে সৎসঙ্গ শোনা প্রভুর কথা শোনা এই সব স্বাধ্যায়ই বলা হয়।

সাধানভাবে **তপ** করা: সাধারণ মানুষ হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করাকেই তপ মানে। বাস্তবে ইহা তপ এর সবচেয়ে উচ্চ অবস্থা। একজন সাধারণ মানুষ দৈনিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সংযম রেখে তপ করতে পারে যেমন প্রচন্ড গরমেও পাখা এসি থাকা সত্বেও কিছু ঘণ্টার জন্যে তার ব্যবহার না করা, উপবাস করা, যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে শক্ত রাখা এক রকম তপ, উদাহরণ হিসেবে আমাদের দৈনিক রুটিন এর নিয়ম অনুযায়ী কাজকর্ম সম্ভব না হলেও সংযম রাখা এক রকম তপ, উদাহরণ কোনো দিন আমরা পরিস্থতিতে স্নান না করতে পারি তবুও মনকে শান্ত ও শক্ত রাখা! যদি গুরুজন রাগের বশে কিছু বলে দেন আর ভুল না করা সত্বেও সেটা হাসি মুখে সহ্য করাকেও তপ বলে।

অপ্রয়োজনীয় কথায় মন না দেওয়া নিজের কথাতে সংযম রাখা তপ এরই ভাগ। একাদশীর ব্রত করা ঘরে উৎসবে সবাই নতুন কাপড় বানাচ্ছে যদি নিজে তাতে সংযম রাখি তবে এটাও একটা তপস্যা। দিনে ঘরে খাবার তৈরি হবার পর একবেলা ভোজন না করাও এক প্রকার তপস্যা অর্থাৎ ছোটো ছোটো ব্যাপারে সংযম বা নিয়ম মানলে ধর্ম পালনের ইচ্ছে জন্মায়। অনুকূল পরিস্থিতির প্রতিকূলতাকে খুশির সাথে মেনে নেওয়াকে তপ বলা হয়। উদাহরণ করবা-চৌথ এর উপবাস রেখে বার বার চাঁদ কে দেখার জন্যে বাচ্চাদের পাঠানো ঘরের বাকি সদস্যদের হয়রানি করানো তপস্যার মধ্যে পড়ে না। এরকম যদি কোনো ব্যক্তি ব্রত রেখে সবাইকে তার বড়াই করতে থাকে নিজের কষ্ট কথা চিৎকার করে বলতে থাকে তবে এইরকম ব্রত কোনো কাজে আসে না তাতে কোনো তপস্যার একাগ্রতা থাকে না।

আর্জবম্ অর্থাৎ সরলতা। সরল হৃদয় ভক্তর কথা উঠলে সবার আগে যার কথা মনে আসে সে হলো শবরী মাতা, যার ছোটবেলাতে নাম ছিল শ্রমনা । সে ছোটো থেকেই খুব নরম সরল স্বাত্ত্বিক স্বভাবের ছিল। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের পাশে দৌর নামে একটি গ্রাম আছে যেখানে শবরী মা এর মন্দির আছে। ওনার বাবা ডাকাতের সরদার ছিল। উনি ভিল জাতির মেয়ে ছিলেন, যাদের মুখ্য জীবিকা পশুদের হত্যা করা। ওনার একটি মেষ শাবক ছিল যার সাথে উনি সারাদিন খেলতেন। তিনি বারো বছর বয়সের বালিকা, যখন তার বিবাহ ঠিক হয়। হঠাৎ একদিন শ্রমনা ঘুম থেকে উঠে তাঁর মেষ শাবককে খুঁজে পান না। অনেক খুঁজে আশপাশে জিজ্ঞাসা বাদ করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও খোঁজ পেলেন না আর খুব দুঃখী আর হয়রান হয়ে গেলেন। দুপুর পর্যন্ত তিনি কিছুখেলেন না। তার এক বান্ধবী এটা দেখে বিচলিত হয়ে ওনাকে একটা ঘরের বাইরে নিয়ে আসেন যেখানে শুধু শ্রমণার মেষ শাবককে নয় আশপাশের সব মেষ শাবক দের বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যখন উনি জানতে চান এরকম কেন করা হয়েছে। ওনাকে বলা হলো যে ওনার বিয়ের পর বরযাত্রীদেরকে এইগুলো ভোজন হিসেবে পরিবেশন করা হবে। এই শুনে শ্রমণা কাদতে শুরু করে। "আমার বিয়ের কারণে এই নির্জীব প্রাণীদের হত্যা করা হবে" - এই কথা ওনাকে দুঃখী করে দিলো। আর কোনো সমাধানের উপায় না পেয়ে ওনার এটাই মনে হয় আমার কথা কেও মানবে না সুতরাং আমি যদি এই ডাকাতির জায়গা ছেড়ে চলে যাই আর বিয়েই না হয় তবে এই সব নির্জীব প্রাণীগুলো বেঁচে যাবে। এই প্রথম ডাকাতের অঞ্চলের বাইরে এসে দৌড়াতে লাগলেন। শ্রমণা লাগাতার তিন দিন পাহাড় কন্দর পার করে খিদে, তৃষ্ণা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একটা জঙ্গলে এসে পড়েন, যেখানে মতঙ্গ ঋষির আশ্রম ছিল। একজন শ্রেষ্ঠ মহাত্মা জঙ্গলে এই অবোধ বালিকাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। বালিকাকে উনি জিজ্ঞাসা করলে কান্নারত শ্রমণা পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়। মতঙ্গ ঋষি এই কথা শুনে দেখে আশ্চর্য চকিত হয়ে যান যে এই বালিকা যে রোজই পশু বলি দেখে থাকবে সে এত্ত সংবেদনশীলতার সাথে ভয় না পেয়ে প্রাণীদের রক্ষার জন্যে এই পর্যন্ত এসে গেছে। নিজের প্রাণের পরোয়া না করে এত দূর এসে গেছে। মতঙ্গ ঋষি বললেন যে যতক্ষণ না কেও খুঁজতে এখানে না আসে ততক্ষণ তুমি এখানে আমার আশ্রমে থাকতে পারো। এই কথা মতঙ্গ ঋষির শিষ্যদের উচিৎ মনে হয়নি কারণ শ্রমনা ভীল জাতির ছিলেন। শ্রমণা যথাসাধ্য ঋষির সেবা করতে থাকে। আশ্রম এর দেখভাল করতে থাকলেন আর ঋষি মতঙ্গ এর কৃপায় পাত্রী হলেন। এইসব দেখে ঋষি কুমারদের ঠিক লাগে না আর নিজের ঋষির নিন্দা করতে থাকেন। নিজের জন্যে ঋষি মতঙ্গ এর নিন্দা শ্রমণার ভালো লাগেনি। তাই উনি সেই আশ্রম ছেড়ে চলে যান। ঋষি মতঙ্গ কিছুক্ষণ ওনাকে খোঁজেন কিন্তু খুঁজে পাননি। শ্রমণা পাশেই জঙ্গলের গাছের উপরে ঘর বানিয়ে থাকতে শুরু করে। ভীলনী জাতির ছিলেন, সুতরাং গাছের উপরে থেকে ফলমূল খেয়ে জীবন কাটাতে শুরু করেন। যে পথ দিয়ে ঋষি মতঙ্গ তার শিষ্যদের সাথে স্নান করতে যেতেন ও প্রতিদিন সেই রাস্তা পাথর কাঁটা পরিষ্কার করে রাখতেন। ঋষি কুমারদের যাতে দুর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ আনতে যেতে না হয় এই ভেবে তিনি নিজেই আশ্রমের বাইরে কাঠ ফেলে রাখতেন। ধীরে ধীরে মতঙ্গ ঋষি আর ঋষি কুমারদের এটা সন্দেহ হয় যে নিশ্চই কোনো ব্যাপার আছে, এক রাত্রে তারা এটা দেখার চেষ্টা করে যে কে এই কাজ করছে? আর দেখা যায় যে এসব শ্রমণার কাজ উনি শ্রমণাকে মতঙ্গ ঋষি আবার আশ্রমে স্থান দেন। কিছু বছর পর মতঙ্গ ঋষি বললেন যে এখন আমার আয়ু পূর্ণ হয়ে গেছে আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে চাই। তাই শুনে শ্রমণা দুঃখিত হয়ে কাদতে শুরু করে। মতঙ্গ ঋষি শ্রমণা কে আশির্বাদ দিয়ে বললেন তুমি এই আশ্রমেই থেকো স্বয়ং শ্রীরাম! প্রভু রাম! এই আশ্রমে আসবেন তোমাকে দর্শন দেবেন নিজের গুরুর কথা সত্য মেনে শ্রমণা ওই আশ্রমেই থাকতে লাগলেন। প্রতিদিন প্রভুর জন্যে জঙ্গলের রাস্তা পরিষ্কার করা, প্রভুর আসন তৈরি করা ভোজনের ব্যবস্থা পূর্ণ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার সাথে করতে লাগলো। একা চুয়াত্তর বছর হাসি মুখে শ্রী রামের প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দেয়। তিনি সরলতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। গুরু আর গুরুর কথা সত্য মেনে প্রভুর অপেক্ষা করতে থাকেন। একদিন শ্রীরাম সীতা মা কে খুঁজতে খুঁজতে ওখানে

মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে পৌঁছান।

তাহি দেइ গতি রাম উদারা। সবরী কें আশ্রম পগু ধারা॥
সবরী দেখি রাম গৃহঁ আए। মুনি কে বচন সমুझি জিযঁ ভাए।

তুলসীদাস জী কি মনোরম বর্ণনা করেছেন। প্রভুকে সুন্মুখে দেখে যে ভাব সবার প্রথমে শবরী মাতার মনে আসে যে গুরুর বচন শেষপর্যন্ত সত্য হলো আর প্রভু শ্রী রাম আশ্রমে প্রবেশ করেন আমাকে উদ্ধার করার জন্যে।

প্রেম মগন মুখ বচন ন আবা। পুনি পুনি পদ সরোজ সির নাবা॥
সাদর জল লৈ চরন পখারে। পুনি সুন্দর আসন বৈঠারে॥

এত বছর যে কথা উনার মনে ছিল যা উনি বলতে চেয়ে ছিলেন প্রভুকে সামনে দেখে সব ভুলে গেলেন আর দুই ভাই শ্রী রামচন্দ্র জী আর লক্ষ্মণ জীর চরণ জড়িয়ে ধরলেন। নিজের বানানো আসনে বসিয়ে ভগবানের চরণ ধুতে শুরু করেন।

কংদ মূল ফল সুরস অতি দিए রাম কহুঁ আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খাए বারম্বার বখানি॥

শবরী প্রেম এর সাথে ফল মূল প্রভুকে অর্পণ করেন আর ভক্তের নির্মল নিঃস্বার্থ ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে ওই ফল প্রভুর এত মধুর লাগে যে তার প্রশংসা ছোটো ভাই লক্ষ্মণ এর কাছে করছিলেন। লক্ষ্মণ জী এটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে প্রভু বার বার শবরীর এঠো কুলের প্রসংশা করছেন। প্রভু রাম নিজ ভক্তের প্রসংশা জনক জীর সন্মুখে ও করেছেন।
কহ রঘুপতি সুনু ভামিনি বাতা। মানউঁ এক ভগতি কর নাতা॥

প্রভুর এটাই উদারতা উনি নর - নারী, জাত - পাত ইত্যাদি বেকার কথা ছেড়ে কেবল ভক্তের ভক্তিতে লীন হয়ে তাতে আত্ম সমর্পণ করেন।

নবধা ভগতি কহউঁ তোহি পাহীং। সাবধান সুনু ধরু মন মাহীং॥
প্রথম ভগতি সন্তন্হ কর সংগা। দূসরি রতি মম কথা প্রসঙ্গা॥4॥

গুর পদ পংকজ সেবা তীসরি ভগতি অমান।
চৌথি ভগতি মম গুন গন করइ কপট তজি গান॥

চৌপাই:
মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিস্বাসা। পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাসা॥
ছঠ দম সীল বিরতি বহু করমা। নিরত নিরন্তর সজ্জন ধরমা॥1॥

সাতবঁ সম মোহি ময জগ দেখা। মোতেং সন্ত অধিক করি লেখা॥
আঠবঁ জথালাভ সন্তোষা। সপনেহুঁ নহিং দেখइ পরদোষা॥2॥

নবম সরল সব সন ছলহীনা। মম ভরোস হিযঁ হরষ ন দীনা॥
নব মহুঁ একউ জিন্হ কেং হোई। নারি পুরুষ সচরাচর কোई॥3॥

সোइ অতিসয প্রিয ভামিনি মোরেং। সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরেং॥
জোগি বৃংদ দুরলভ গতি জোई। তো কহুঁ আজু সুলভ ভइ সোई॥4॥

মম দরসন ফল পরম অনূপা। জীব পাব নিজ সহজ সরূপা॥
জনকসুতা কइ সুধি ভামিনী। জানহি কহু করিবরগামিনী॥5॥

প্রভু শ্রী রাম বলেন যে আমি জাতপাত মানি না। ভগবান শবরী মাতাকে সকলের কল্যাণের জন্যে নবধা ভক্তির উপদেশ দেন। ভগবান বলেন যে নয় রকম ভক্তির দ্বারা ভগবত প্রাপ্তি সম্ভব।

প্রথম সাধু সঙ্গ লাভ করা।
দ্বিতীয় আমার কথা মনে গেথে রাখো।
তৃতীয় অহংকার ত্যাগ করে গুরুর চরণ ধরা।
চতুর্থ কপটতা ছেড়ে ভক্তি দিয়ে প্রভুর গুণ গণ করা। প্রভুর নাম জপ করা আর উনার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা।
পঞ্চম ভক্তির প্রকার।
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত রাখা হলো ভক্তি। সাধু পুরুষ দের ধর্মাচরণ এ যুক্ত থাকা।
সবকিছুর মধ্যে প্রভুকে দেখা ভক্তির সপ্তম প্রকার প্রভুর থেকেও অধিক সাধুদের প্রণাম করা।
যা পেয়েছি তাহা যথেষ্ট এই ভাব রাখা অষ্টম ভক্তি প্রকার।
সেই ভক্ত যে সরল, যে কোনো প্রকার ছল থেকে মুক্ত, নির্মল ভক্ত আমার পরম ভক্ত বলা হয়।
শ্রী রাম বলেন যে শবরী যে নবধা ভক্তির স্বরূপ এর মধ্যে কোনো একটি মার্গ বেছে নিয়ে নিষ্ঠা ভাবে কোনো প্রাণী আমার ভজন করলে সে অবশ্যই আপনাকে প্রাপ্ত হবে। আর শবরী আপনার মধ্যে তো এই সব নবধা ভক্তির নয় রূপ বিদ্যমান। প্রভু তাঁর পরম ভাগ্যশালী ভক্তর উপরে কৃপা বর্ষণ করেন তিনি লাপরবাহ শরীর ত্যাগ করেন। কোটি কোটি তপস্যার পরও ঋষিগণ যা প্রাপ্ত করেন নি সেই দুর্লভ গতি শবরী পেয়েছিলেন। মাতা শবরী যেমন সরল তার লেশ মাত্র অংশ যদি আমাদের জীবনে আসে তবে আমাদের জীবন সার্থক হয়।
হরি শরণম্! হরি শরণম্!

প্রশ্নকর্তা - সুমিত জী
প্রশ্ন - এমনিতে আমি কয়েক বছর ধরে এই স্বামী রামসুখদাসজী র সি ডি থেকে গীতা কে পড়ছিলাম। কিন্তু শুদ্ধ পঠন হচ্ছিল না। দয়া করে শুদ্ধ পাঠ এর গুণের মহত্ত্ব বলুন?
উত্তর - যখন আমরা গীতার শুদ্ধ পাঠ করি তখন আমাদের গীতার পঠন - পাঠনে আগ্রহ বহু গুণ বেড়ে যায়। ভগবানের কাছে শুদ্ধ থেকে অধিক প্রিয় ভক্তের ভক্তি। বাল্মীকি মরা মরা বলতে বলতে রাম কে প্রাপ্ত করে ছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ আমাদের দেহে গভীর প্রভাব পড়ে সুতরাং শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ দরকার হয়।

প্রশ্নকর্তা - শশী ভূষণ জী
প্রশ্ন - আমার এটা জিজ্ঞাসা করার ছিল যে আমরা যদি বাচ্চাদের গীতাজী র পাঠ পড়ানোর জন্যে পাঠাতে চাই তাহলে কিসের মাধ্যমে করতে পারি?
উত্তর - গীতা পরিবারের ফেসবুক পেজ এ অনেক ভিডিও আছে।

প্রশ্নকর্তা - অভিমন্যু জী
প্রশ্ন - শবরীর সুন্দর কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। জানতে চাইছি যে আমরা কিভাবে সবসময় ঐরকম সরল ভাবে থাকতে পারি?
উত্তর - আমরা আমাদের দৈনিক জীবনে যত সাত্বিক ভাব বাড়াতে থাকবো যত সৎসঙ্গ করবো ততই সংশয় কেটে যাবে এবং বুদ্ধি স্থির হবে। একটু সৎসঙ্গ শুনে, কিছু কীর্তন করে করে কোটি বছরের যে বাসনা ইচ্ছে সাথে আছে সেটা ত্যাগ করা কঠিন। সুতরাং ক্রমাগত সৎসঙ্গ করে যাওয়া উচিত। মনে যে লালসার উদ্রেক হয়েছে নিজেকে স্থির করার জন্যে সেটা বাড়াতে হবে। সাধুর দর্শন দ্বারা সাধুর সঙ্গ দ্বারা উনার কৃপায় নিজের জীবন তেজের সাথে এগিয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা - নীলিমা জী
প্রশ্ন - ভাই আমি এটা জানতে চাইছি যে ,যে শ্লোক ই আমরা পড়ি তার শাব্দিক অর্থ কি করে জানতে পারবো?
উত্তর - আজকাল সব বিবেচনগুলিকে ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠানো হয় আপনি সেখান থেকে পড়ে অর্থ জানতে পারবেন। এমনিতে গীতা প্রেস গোরখপুর এর আনমোল গীতা পাওয়া যায় যা পড়ে শাব্দিক অর্থ খুঁজে পেতে পারেন।

।।শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||